বাঙালার বিলুপ্ত সম্পদ—কথকতা

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন

যে কোনো বাঙালী পাঠক দীনেশচন্দ্র সেনের (১৮৬৬—১৯৩৯) নাম জানেন। তাঁর লেখা ঘরের সাধনা ও যুগসাহিত্য, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বা বৃহৎবঙ্গে নানা প্রসঙ্গে কথকতার কথা এসেছে। কথকতার পালা অবলম্বন করে তিনি নানা জমাট ছোট ছোট বইও লিখেছেন। সেইসব রচনার তুলনায় আলোচ্য প্রবন্ধটি অজানা। কথকতার বিবরণী অপেক্ষা দীনেশচন্দ্র সেনের মানসিকতার পরিচয় পাবার জন্য প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ। বিংশ শতকের সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে ও রুচি পরিবর্তনের যুগে লোকশিক্ষার অন্যতর দেশজ বীরাকে গুরুত্ব দেবার পেছনে কী কী যুক্তি কাজ করছে, সেইগুলি যে কারুর কৌতূহলকে উসকে দিতে পারে। আরো লক্ষ্য করার বিষয় এই যে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানিক পাঠক্রমেও কীর্তন ও কথকতাকে জুড়ে দেবার উদ্যোগ দীনেশচন্দ্র সেন নিয়েছিলেন, ধরতাই দিয়েছিলেন প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

প্রবর্তক / ২২ বর্ষ / ১ম খণ্ড / ৪র্থ সংখ্যা / শ্রাবণ / ১৩৪৪ প্রবন্ধ / বাঙালার বিলুপ্ত সম্পদ—কথকতা / প্রবন্ধকার/রায়বাহাদুর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন—ডি-লিট।

আমাদের এই সোনার বাঙালার প্রাচীন সংস্কৃতির ঐশ্বর্য কত দিক্ দিয়া যে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন প্রকাণ্ড অজগর যেরূপ একখানে শুইয়া থাকিয়া তাহার নিঃশ্বাসের আকর্ষণে দূর-দূরান্তর হইতে অসন্দিগ্ধ জীব-জন্তুদিগকে নিজের কাছে টানিয়া তাহার উদর পূর্তি করে, সেইরূপ বিদেশাগত জড় সভ্যতার প্রবল আকর্ষণে আজ এদেশের আধ্যাত্মিক সম্পত্তি প্রতীচ্যের আদর্শের কবলিত হইতেছে। এ বিষয়ে বেশী বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন ; সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন এদেশের ভক্তি, যাহা শতমুখী গঙ্গার ন্যায় এককালে আনন্দের মহাসাগর-সঙ্গমে আসিয়া লীন হইয়াছিল এদেশের প্রেম, যাহা চৈতন্যদেবের পদরজে পূত হইয়া বঙ্গের কুটিরে কুটিরে শত শত খোল-করতাল ও মন্দিরার নিক্কন-সহকারে পথে-ঘাটে বহিয়া গিয়াছিল—এদেশের ত্যাগ, যাহা রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস-গ্রহণ, রূপ-সনাতন-শ্রীজীব, রাজকুমার রঘুনাথ, যুবরাজ নরোত্তম, ধনকুবের উদ্ধারণ দত্ত এবং সেদিনকার পাইকপাড়ার লালাবাবুর ভিখারীর কন্থা-গ্রহণের দৃশ্য দেখাইয়া অধ্যাত্ম-জগতের বাস্তব মহিমা প্রকটিত করিয়াছিল, সেই ভক্তি, সেই প্রেম ও ত্যাগের উৎস জড়-সভ্যতার শুষ্ক মরুভূমিতে পড়িয়া শুকাইয়া যাইতেছে। কোথায় গেল সেই সকল কৃষ্ণযাত্রা, যাহা এককালে শ্রোতৃ-বর্গের চক্ষে অশ্রুর বান আনয়ন করিয়া মর্ত্যধামে ভক্তি-স্বর্গের শতদল ফুটাইয়াছিল, কোথায় গেল সেইসকল কীর্তন, যাহা শুনিতে শুনিতে রাত্রি কিভাবে পোহাইয়া যাইত, লোকে তাহা বুঝিতে পারিত না, উন্মত্তের মত হাসিয়া কাঁদিয়া রাত্রি জাগরণ

করিত এবং গঙ্গাজলে অবগাহন করিলে যে পুণ্য হয়, তাহা অর্জন করিয়া ধন্য হইত? কোথায় গেল সে কথকতা, যাহা গল্পচ্ছলে বেদ-বেদান্তের তত্ত্ব লোকদিগকে সহজে বুঝাইয়া হাসি-কান্নার মধ্য দিয়া জীবনের মহা সত্যগুলি জনসাধারণের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিত? হে দেব-বাঞ্ছিত ধর্মক্ষেত্র হিন্দুস্তানের অধিবাসীগণ, তোমাদের পূর্বপুরুষেরা তোমাদিগকে সত্যদ্রষ্টা ঋষিদিগের সাধনালব্ধ মহাসত্য রাজা-প্রজা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকে নির্বিচারে হরির লুটের মত বিতরণ করিবার জন্য যে সকল পন্থা সুগম করিয়া গিয়াছিলেন, কালিঘাটের গঙ্গার ন্যায় তাহা যে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া নিরুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিতেছে! শত সহস্র বৎসর হইতে এই শিক্ষা সমাজের উর্দ্ধস্থান হইতে অধস্তন স্তর পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়া জনসাধারণকে উন্নতির শৃঙ্গে সমারূঢ় করাইয়াছিল। এদেশের বহু অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন হাভেল সাহেব বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষের পটুয়ারা পাশ্চাত্য-মতে মূর্খ, কিন্তু জগতের চিত্রকরদের মধ্যে তাহাদের শিক্ষা সকলের উপরে"[১] ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অগাধ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডাঃ লিফ্‌য় বলিয়াছেন—"দরিদ্রতম এবং নিরতিশয় অশিক্ষিত হিন্দু কৃষকগণ অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দার্শনিক ও নীতিঘটিত আলোচনা করিতে পারে।"[২]

যে দেশের অক্ষর-জ্ঞানের প্রচার খুব ব্যাপকভাবে না হইলেও উচ্চশিক্ষা কুটিরে কুটিরে ঢুকিয়াছিল,—রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, গীতা প্রভৃতির তত্ত্বকথা ও উপাখ্যান এককালে চাষাদের মধ্যেও প্রচলিত হইয়াছিল; সেই দেশের জনসাধারণ তাহাদের উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়া সিনেমার নর-নারীদের চুম্বন আলিঙ্গনাদি দেখিয়া হীন লালসা-পন্থী হইতেছে। কোনই উচ্চ আদর্শ নাই; কলঙ্কিত জীবনের হীন বাস্তবতা ও অর্ধ-উলঙ্গ নর-নারীদের বীভৎসতাপূর্ণ সিনেমা প্রভৃতি পাশ্চাত্য আমোদ-প্রমোদে সত্যই সমাজে একটি ঘৃণিবায়ু আনিয়াছে এদেশে সত্যই কি ঋষিদের সাধনা-লব্ধ মহাসত্যগুলি একেবারে অতলে ডুবিয়া যাইবে? জড়-সভ্যতার এই আকর্ষণ যদি এখনও নিরোধ করা না যায়, তবে হিন্দুস্তান হইতে হিন্দুজাতি একেবারে বিলীন হইয়া যাইবে। হ্যাট-কোট-পরা পুরুষ ও হিলতোলা-জুতা পরিহিত বব্ ফ্যাসনে কেশ-বিন্যাস দুরন্তা রমণী,—এইরূপ একান্ত ফিরিঙ্গীভাবাপন্ন কতগুলি হিন্দুর বংশধর টিকিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু যে হিন্দুরা উপনিষদ লিখিয়াছিল, রামায়ণ, মহাভারতের উচ্চ আদর্শ লোকের সম্মুখে ধরিয়াছিল, যে সকল কবি মহাদেবের নিবাত-নিষ্কম্প-দীপশিখার ন্যায় সমাধির চিত্র আঁকিয়াছিল, যে সকল মহিলারা স্বার্থ জানিতেন না, ত্যাগ ও প্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেবীপদবাচ্যা হইয়া চিরবরেণ্যা হইয়াছিলেন; তাঁহারা কোথায়? তাঁহারা কি চিরকালের জন্য বিদায় লইলেন? ভারতের সীতা, ভারতের সাবিত্রী, ভারতের দময়ন্তী ও বেহুলা,—এককথায় হিন্দুনারীর প্রকৃত আদর্শ কি নিশ্চিহ্ন হইয়া এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইবে? সাধুর নামাবলী, সতীর কপালের সিন্দুর আর এদেশে কুড়াইয়া পাওয়া যাইবে না? যাহারা হিন্দুস্তানকে ধর্মচ্যুত হইয়া জড় সভ্যতার পাণ্ডা হিটলার ও মুসোলিনীর তাণ্ডব-লীলার ক্ষেত্রে পরিণত দেখিতে

চান, আমরা তাঁহাদের দলে নই। সোপেনহায়ার, ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি বিদেশী পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, উপনিষদ তাঁহাদের জীবনের শেষ আশ্রয়, ইহা সত্যের খনি ও মনুষ্য-জাতির মাথার মুকুট ; আমরা কি আমাদের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গৌরব তত্ত্বজ্ঞান ছাড়িয়া দিয়া "আঁচলে মাণিক বেঁধে কেঁদে কেঁদে—" দুর্গম বাস্তব অরণ্যে ঘসা পয়সার লোভে ঘুরিয়া বেড়াইব ?

সিনেমা ও বর্তমান কালের পাশ্চাত্য আদর্শে গড়া যৌনপ্রেমের বীভৎসতাপূর্ণ থিয়েটার-গুলি হইতে জনসাধারণকে বাঁচাইতে হইবে। আমরা এখন মুমূর্ষু রোগী, আর সময় নাই ; আশা করি ঘুম ভাঙিয়া আবার এ জাতি জাগিয়া উঠিবে। হে হিন্দুস্তানের ব্রাহ্মণ, আমরা তোমাদিগকেই আহ্বান করিতেছি। তোমরা ঊর্ধ্ববাহু হইয়া সাধনা করিয়াছ, তোমরাই পঞ্চাগ্নিক হইয়া জ্বলন্ত আগুনে আসন পাতিয়া বসিয়া তপস্যার অকথ্য কৃচ্ছ্রের আদর্শ দেখাইয়াছ— তোমরাই আহিতাগ্নিক, তোমরাই শ্বাসনে বসিয়া অমানিশার বিভীষিকায় অটলপণে ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়াছ, প্রবল ঝটিকা ও শিলাবৃষ্টিতে তরুরাজ উৎপাটিত হইয়া ও যেরূপ অবশিষ্ট কয়েকটি মূল দিয়া ধরিত্রীর বক্ষ আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, তোমাদের পূর্বপুরুষ সাধকগণ ও সেইরূপ শত ঝঞ্ঝার মধ্যে ভগবানের নামরূপ পোতাশ্রয় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই মহাজ্ঞান যে আমরা হারাইয়া ফেলিতে বসিয়াছি। হে ব্রাহ্মণ, জাগো, জাগো, এই নিদ্রা যেন মহানিদ্রায় পরিণত না হয়। যুগে যুগে তোমরা সমাজের উচ্চতম আদর্শ বাঁচাইয়া রাখিয়াছ ; আজ যেন সমাজের ভরাডুবি না হয়। জাগো ব্রাহ্মণ,—জাগো মনু, বশিষ্ঠ, পরাশর, জাগো বিশ্বামিত্র যাজ্ঞবল্ক্য,—তোমরা ধর্মশাস্ত্রের পত্রে অমর হইয়া আছ, তোমরা আমাদের চক্ষু-উন্মীলনে সহায় হও। হে পিতৃগণ, এই দুর্দিনে আমাদিগকে বাঁচাও। হে নিভৃত কন্দরবাসী সন্ন্যাসী, অযাচক বৃত্তিসাধক মাধবেন্দ্রপুরী, হে বর্ত্তমান যুগের কিরীটরত্ন রামপ্রসাদ, পরমহংস রামকৃষ্ণ, আমাদের এই ঘোর বিপত্তি কালে আমাদিগকে বাঁচাও। আসুন আমরা উপবাস ও অনিদ্রার ব্রত ধারণ করিয়া ভগবানের পথে জানাই, যেন এই জপ-তপ-সাধনার রাজ্যে জপ, তপ ও সাধনা বিলুপ্ত না হয়।

কি উপায়ে এই জড় সভ্যতার স্রোত নিরোধ করিতে হইবে, তাহাই এখন আমাদের ভাবনার বিষয়। আমরা একটি মাত্র উপায় লইয়া আজ এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিব। আরোও দশরূপ উপায় আছে, কিন্তু আমরা একটি মাত্র প্রসঙ্গে আবদ্ধ থাকিব।

১৪ই এপ্রিলের (১৯৩৭) "স্টেটসম্যানে" ভারতের কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে একটি আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে এই কথা-সাহিত্য যে কীরূপ বিস্তৃতভাবে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তাহা লেখক দেখাইয়াছেন। কিন্তু তিনি অনেক কথাই লেখেন নাই।

রামায়ণে দেখা যায়, যখন অযোধ্যার বিপদাশঙ্কায় মাতুলালয়ে ভরত দুঃস্বপ্ন দেখিয়া বিমনা হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মাতুল যুধাজিৎ নানা উপায়ে তাঁহার মন হইতে সেই অবসাদের ভাব দূর করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন ; সেই উপায়ের মধ্যে কথা বলিবার

জন্য নিযুক্ত লোকেরা নানা উপাখ্যান বলিয়া তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। হিতোপদেশও রাজদরবারে এইরূপ গল্প করিবার প্রচলিত প্রথার ফল। ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায়ে রাজসভায় এইরূপ গল্প-রচয়িতাদের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। আকবরের সভায় বীরবল ছিলেন; ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, এই ব্যক্তি মোগল সম্রাটের কত প্রিয় ছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁহার সভার আমোদ-প্রমোদ বহু পরিমাণে ছাঁটিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু "গল্প-বলিয়ের" স্থানটি টলাইতে পারেন নাই। রাজান্তঃপুরে এইরূপ গল্প বলিবার জন্য শিক্ষিতা মহিলারা নিযুক্ত থাকিতেন। চন্দ্রাবতীর রামায়ণে দেখা যায়, ইহাদের উপাধি ছিল "আলাপিনী"। "মুতাক্ষরীণে" দৃষ্ট হয় আলিবর্দী খাঁ প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া আলাপকারীদের কথা শুনিতেন এবং মীরজাফরের পাপিষ্ঠ পুত্র মীরণের যে রাত্রে বজ্রপাতে মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার সঙ্গে আলাপিনীরা ছিলেন।

হিন্দু-রাজসভায় গল্পকারকদের স্থান আবহমান কাল হইতে অটুট ছিল। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরচন্দ্রের সময়ও ১৮৮৪ হইতে ১৮৯৭ খৃঃ অঃ পর্যন্ত ঢাকা-ধামরাই নিবাসী ভারতচন্দ্র রায় নামক এক গল্পকারক তাঁহার সভায় মাসিক ৬০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত ছিলেন এবং ভাওয়াল মোকর্দ্দমায় সাক্ষীদের জবানবন্দীতে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, ভাওয়ালস্টেটেও এরূপ বেতনভোগী গল্পকারক ছিল।

কিন্তু ব্রাহ্মণগণ জনসাধারণের শিক্ষার জন্য কথকতার ন্যায় যেরূপ অমোঘ উপায়ের উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন, তাহা একদিকে প্রেম, ভক্তি, ত্যাগ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক জ্ঞান, অপরদিকে বাস্তব জীবনের উপভোগ্য হাস্য-পরিহাস ও কৌতুকাবহ ঘটনা দ্বারা সেই সকল কথা অমৃতময় করিয়া তুলিতেন। অসাধারণ শব্দ-মন্ত্রে খচিত রূপ-বর্ণনা, যুদ্ধবর্ণনা প্রকৃতিবর্ণনা, দেবদেবীর মূর্ত্তি-বর্ণনায় উপাখ্যান-ভাগ এমন জীবন্ত হইত যে, লোকে তাহা শুনিয়া সময়ের জ্ঞান ভুলিয়া যাইত। হয়ত এখনও এরূপ লোক জীবিত আছেন, যাহারা ধরণী পাঠকের কথা শুনিয়াছেন। তাঁহার কথা একই সময়ে হাসি ও কান্নার ফোয়ারা ছুটাইয়া, একসঙ্গে রৌদ্র-বৃষ্টির ন্যায় শ্রোতৃবর্গকে কৌতুক দিতে পারে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে কথকশ্রেষ্ঠ হাস্যার্ণব গল্পগুলি তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তি দ্বারা বিমণ্ডিত করিতেন; আমরা ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমপুরবাসী এক কথকের মুখে ধ্রুবোপাখ্যান শুনিয়াছিলাম। "ধ্রুব কি দেখিতেছ"—বলিয়া নারদ প্রশ্ন করিলেন, তখন গলদশ্রুচক্ষে কথক ঠাকুর ভগবানের ময়ূরপুচ্ছের কিরীট হইতে আলতারাঞ্জিত চরণযুগের যে মূর্ত্তি সুর করিয়া বর্ণনা করিলেন, তাহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ অশ্রুবন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল; দীর্ঘনিঃশ্বাসের তুফান উঠিয়াছিল। যখন জোড়াসাঁকোর খ্যাতনামা ঠাকুর কুলেন্দু গগনেন্দ্রনাথ পুত্রশোকে কাতর হইয়া তাঁহার কোন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—"আমি কিছুতেই মনে শান্তি পাইতেছি না; এরূপভাব বেশী দিন থাকিয়া পাগল হইয়া যাইব, আমার উপায় বলুন।" তখন সেই বন্ধুর অনুরোধে ও

পরামর্শে বাগবাজারের ক্ষেত্র কথক সেই বাড়ীতে নিযুক্ত হইলেন। প্রায় দেড় মাস কাল ক্ষেত্রকথক ব্যাসাসনে বসিয়া মাথায় ফুলের মালা পরিয়া কথকতা করিয়াছিলেন, ঠাকুর গোষ্ঠির সকলে সন্ধ্যাকালে সেই আসর জমাইয়া বসিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁহাদের বহু বান্ধব ও পরিবারের এই কথকতার আসরে উপস্থিত থাকিতেন! রবীন্দ্রবাবুও মাঝে মাঝে দুই-একদিন উপস্থিত হইতেন। ক্ষেত্র কথকের গল্প বলিবার শক্তি এরূপ অসাধারণ ছিল যে, তিনি যেন কথার হরিলুট দিয়া যাইতেছেন; এরূপ নিপুণতার সহিত তিনি গল্প বলিয়া যাইতেন যে, মনে হইত যেন ভারত-বিখ্যাত পৌরাণিক নায়ক-নায়িকারা আমাদের নিকটে প্রত্যক্ষীভূত হইতেন গল্পে ও গানে সমৃদ্ধ এই কথকতা যেন উত্থান-পতনশীল তরঙ্গের মত গল্প-সাগরে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য চিত্র প্রকটিত করিত। গগনেন্দ্রনাথ ও তাঁহার দুই ভ্রাতা ভগবানের আশীর্ব্বাদে এখনও বিদ্যমান,—তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন, ক্ষেত্র কথকের অমৃতময় কথকতায় তাঁহাদের পরিবারের পুত্র-শোকের নিদারুণ ব্যথা অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছিল। অথচ একথা নিশ্চিত যে; এই কথকতা সিনেমার ন্যায় অল্পদরের কৌতুক ও আমোদ প্রদান করিত না। গল্পগুলি ছিল সারগর্ভ; সুনীতিপূর্ণ ও ভক্তি-গঙ্গার জলে শোধিত। কিছুদিন হইল কৃষ্ণ কথকও স্বর্গীয় হইয়াছেন; ক্ষেত্রকথকও আর নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এখনও বাঙ্গালার অলি-গলিতে সেই প্রাচীন ভক্তি-প্রবাহ পাতালের ভোগবতী গঙ্গার ন্যায় বাহিয়া যাইতেছে; উৎসাহ পাইলেই এই কথকশ্রেণী আবার তাঁহাদের প্রতিভা দ্বারা আসর জমাইতে পারেন। প্রাচীন সংস্কৃতির যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া সমাজে লোক-শিক্ষার ব্যাপকভাবে বিস্তার হইয়াছিল; সেই সকল উপায় ছাড়িয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। নিম্নশ্রেণীর পাঠশালা দ্বারা শিক্ষার যে প্রচলন হয়; তাহা কি কীর্তন বা কথকতার মত কার্য্যকরী? কীর্তন ও কথকতায় জাতি ও শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ যে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রেরণা পাইত, নিম্ন বা উচ্চ প্রাইমারী স্কুল-গুলি কি তাহার শতাংশের একাংশ জ্ঞানের কণা বিতরণ করিতে পারে? অথচ এই বঙ্গদেশে নিম্নশ্রেণীর আক্ষরিক জ্ঞানের জন্যও যে সকল পাঠশালা ছিল, তাহার সংখ্যাও অল্প ছিল না। লং সাহেব তাঁহার ক্যাটালগে একশত বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন—"বঙ্গদেশে শুভঙ্কর নামক এক কায়স্থ, যাঁহাকে বাঙ্গালাদেশের ককার আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, তাঁহার আর্য্যা দেড়শত বৎসর যাবৎ প্রায় ৪০০০০ পাঠশালায় আবৃত্তি হইয়া আসিতেছে, সুতরাং সংখ্যা-গণিতে হিন্দুরা অগ্রণী, তাহাদের পরে আমাদের ইংলন্ডের শিশুবিদ্যালয়ে শিক্ষার এই রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে।"

কিন্তু প্রাইমারী বিদ্যালয়ই হউক, কিংবা হাইস্কুলই হউক কথকতা ও কীর্তন প্রভৃতি-দ্বারা যেরূপ উচ্চশিক্ষা অতি মনোরমভাবে ও ব্যাপকরূপে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইত, সেই সকল যুগ যুগ ব্যাপী, বহু পরীক্ষিত, শিক্ষিত, ফলপ্রসূ উপায় কি আমাদের ছাড়িয়া দেওয়া উচিত? মানুষ আনন্দ চায়। উপদেশ যখন বেতের সাহায্যে

প্রচারিত হয়, তখন তাহা ভয়ের উদ্রেক করে। গুরুমহাশয়ের উপদেশ প্রায়ই তিক্ত হয়; তৎস্থলে কথক ঠাকুরের ব্যাখ্যা ও গল্প নানারূপে হৃদয়স্পর্শী সঙ্গীতের সহযোগে নিশ্চিত ও অধিকতর প্রেরণা দান করে এবং মধুর রসের মধ্য দিয়ে সমাজকে গড়িয়া তোলে।

এ দেশের প্রাণ মাতানো এই দুই উপায় কীর্ত্তন ও কথকতা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ পাদ্রীদের উপদেশে ঘৃণার সহিত ফেলিয়া দিয়াছেন। স্কুলে বেত্রহস্ত শিক্ষকের হাত হইতে ত্রাণ পাইয়া তরুণেরা হয় সিনেমায় আনন্দ খুঁজিতে যায়, নতুবা গোয়েন্দার গল্প বা অতীব অপকারী কুৎসিৎ যৌন গল্প পড়িয়া মনোবৃত্তি কলুষিত করে। আপনারা তাহাদিগকে বঙ্গীয় পল্লীবাহী পবিত্র আনন্দধারা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের বুভুক্ষিত ও তৃষ্ণার্ত মন সেই আনন্দের খোঁজে যাহা অবলম্বন করে, তাহা যে তাহাদের পক্ষে বিষ।

কীর্তন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমরা এই সন্দর্ভের উপসংহার করিব। কিন্তু এখানে আমি কথকতা সম্বন্ধে একটা প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা দিব। আশা করি, আপনারা এ বিষয়টি একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

ধরুন, দক্ষিণ ও উত্তর কলিকাতার সন্ধিস্থল কলেজ স্ট্রীট বা কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের উপর একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় কথকতার একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হউক। সেই গৃহে একটা বড় হল থাকিবে, যাহাতে অন্ততঃ পাঁচশত লোকের স্থান হইতে পারে।

বৎসরে একবার এই স্থানে কথকদের মধ্যে প্রতিযোগীতার পরীক্ষা হইবে। বঙ্গদেশের নানা জেলা হইতে অনধিক ১৫ জন কথকের পরীক্ষা হইবে; পরীক্ষান্তে তিনজনকে উপাধি ও পুরস্কার দেওয়া হইবে।

এইভাবে উপাধি ও পুরস্কারপ্রাপ্ত কথকগণ বৎসর ভরিয়া পূর্বোক্ত 'হলে' কথকতা করিবেন, কথকতা সপ্তাহে দুইবার হইবে।

গৃহের অপর প্রকোষ্ঠে অধ্যাপকগণ অনধিক দশজন ছাত্রকে কথকতা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। এই কথকতা আনুষাঙ্গিক উচ্চশিক্ষাও তাঁহারা এইখানে পাইবেন। দুই বৎসর তাঁহাদের 'কোস' (কোর্স) শেষ হইবে এবং তাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'কথকরত্ন', 'কথা-প্রদীপ' প্রভৃতি ভাবের উপাধি ও পুরস্কার পাইবেন। যিনি প্রতিযোগীতার পরীক্ষায় বৎসরান্তে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহার উপাধি হইবে 'আচার্য্য কথক'।

কথকতার যে প্রাচীন 'কোড' বা শাব্দিক বর্ণনারীতি আছে, যাহা সুললিত শব্দবহুল ও সংস্কৃতাত্মক; সেই 'কোড' বর্ত্তমান রুচি, সংস্কৃতি ও প্রয়োজনানুসারে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে।

পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির প্রাচীন নীতি ও ধর্মভাব অমূল্য; তাহার বিষয়বস্তুও চিত্তাকর্ষক, ঘটনা বর্ণনাও কৌতূহলোদ্দীপক; কিন্তু আধুনিক সময়ে ঐতিহাসিক জ্ঞানের বিস্তৃতি ও গল্পরীতির বিবিধভাবে বিচিত্রতা সাধিত হওয়ার ফলে অনেক নূতন বিষয় কথকতার উপযোগী হইয়াছে সেই সকল নূতন নূতন বিষয় কথকতার অন্তর্গত করিতে হইবে; তাহা লইয়া 'কথার' খসড়া প্রস্তুত করিতে হইবে। সমস্ত কথাগুলিই

একটা কমিটির বিচারাধীন করিয়া ; তাহা অনুমোদিত করিয়া সাধারণের কাছে উপস্থিত করিতে হইবে।

উপাধি ও পুরস্কারপ্রাপ্ত 'আচার্য্য কথকের' কথা শুনিতে ভীড় হইবে। সিনেমার গল্পগুলি নানারূপ বিজ্ঞাপন দিয়া ভীড় জমায় ; কিন্তু পাশ্চাত্যভাবে গড়া বিষয়গুলি জনসাধারণকে কি তাদৃশ তৃপ্তি দিতে পারে ? কোন কোন সিনেমার কর্তৃপক্ষ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—এখন পৌরাণিক বিষয়গুলি যেরূপ আদৃত হয়, রঙ্গমঞ্চে জড়বাদী মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক গল্প সাধারণ জনতাকে তাদৃশ আনন্দ দিতে পারে না। পৌরাণিক গল্পগুলি জন্মিয়াছিল সাধনার ক্ষেত্রে ; এখনকার বিষয়বস্তু অনুকরণের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এদেশের লোকের প্রাণে সেরূপ সাড়া পায় না। অর্ধশিক্ষিত, কলেজফেরতা ও ফিরিঙ্গিভাবাপন্ন কতকগুলি লোক বিলাতী প্রসিদ্ধ সিনেমার গল্পলেখক ও নটনটীদের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য দেখিয়া বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে সেই অভিনয়ের বাহবা দেন ; সেই সার্টিফেকেটে ভীড় জমে ; কিন্তু জনসাধারণ তাদৃশ তৃপ্তি পায় না। এখনও 'সীতা' 'পাণ্ডবগৌরব' প্রভৃতি যে সফলতা লাভ করিয়াছে, তাহা রেকর্ড হইয়া রহিয়াছে।

এই মুহূর্তে যখন প্রাচীন আদর্শের দিকে প্রবৃত্তি জাগিয়াছে, এখন যদি কথকতার আনন্দলোকের তোরণ পুনরায় তাহাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয় ; তবে সিনেমার এই মহা-অনিষ্টকর আকর্ষণ কমিয়া যাইতে বাধ্য। বিশেষতঃ, যদি শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার ভার নেন ও বিশ্ববিদ্যালয় পৃষ্টপোষক হইয়া পরীক্ষা ও উপাধির ব্যবস্থা করেন, তবে জন-শিক্ষার এই প্রধান উপায়টি পুনরায় সজাগ হইয়া জনসাধারণকে ; বিশেষতঃ তরুণ-দিগকে সুপথে পরিচালনা করিতে পারে।

জার্ম্মানীতে পুনঃ পুনঃ স্বদেশের পূর্ব্ব-সংস্কৃতি ইতিহাসের নব যুগে জাতীয় জীবনে ফিরিয়া আসিয়াছে, স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাসে নব কলেবর দিয়া জাপান স্ব-সমাজের কল্যাণসাধন করিয়াছে। আর ঋষি-শাসিত ভারতবর্ষে বেদ-উপনিষদের দেশে, সাধনার নিজ নিকেতনে কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অবলম্বিত পন্থাগুলি বর্জন করিয়া আমরা কোন উচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছিবার আশা করিতে পারি ?

আশুতোষ ও চিত্তরঞ্জন একত্র সহযোগ করিয়া কীর্ত্তনের প্রতিযোগীতা পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, এতদর্থে একটি ক্ষুদ্র কমিটিও গঠিত হইয়াছিল। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ও এই প্রবন্ধ লেখক সেই কমিটির সদস্য ছিলেন। সেই মহারথদ্বয়ের অকাল অন্তর্ধানে তাঁহাদের পরিকল্পনা আকার ধারণ করিতে পারে নাই। কিন্তু কীর্ত্তনের প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষা একটা বৃহৎ ব্যাপার। বহু গায়ক ও বাদক লইয়া এক একটি কীর্ত্তন সম্প্রদায়। দশটি সম্প্রদায়কে আহ্বান করিতে হইলে অনেকরূপ ব্যবস্থা ও বহু ব্যয়ের প্রয়োজন। বিশেষতঃ, এক একটি পালা গাহিতে ৮।১০ ঘণ্টার দরকার ; কথকমাত্র একটি ; সুতরাং কীর্ত্তনের মত কথকতা জটিল ব্যাপার নহে ; ইহা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। কত টাকা হইলে এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়া

কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে, তাহার হিসাব পরে হইবে। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যদি পুষ্টপোষক হন, তবে ইহার সফলতা অনিবার্য্য। যিনি বঙ্গদেশের দুরন্ত ছেলেদিগকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনিয়া এরূপ অসাধ্যসাধন করিয়াছেন; তিনি দুর্নীত আমোদপ্রায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির হীন আদর্শ হইতে তরুণগণের মানসিক প্রবৃত্তি সহজ ও সুগম ও নীতিমার্গে প্রবর্তিত করিতে অবশ্যই সমর্থ, বিশেষতঃ কথকতার ইক্ষুক্ষেত্রে প্রচুর আনন্দরস সঞ্চিত আছে।

বঙ্গদেশের হাওয়া এখন ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, ক্যানসার প্রভৃতি মারাত্মক রোগের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যার 'শয্যা'র ব্যবস্থা করিলে যে উপকার না হইবে, তাহা নহে; সহস্র সহস্র রোগীর মধ্যে দুই-চারিজন উপকৃত হইবে; তাহাও কম লাভ নহে। কিন্তু ঝিনুক দিয়া সমুদ্র সেঁচার মত; বহুকালের প্রচেষ্টা এবং সরকার ও সাধারণের সহযোগিতা ও লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ব্যাধিক্লিষ্ট বঙ্গদেশকে কতক পরিমাণে রোগমুক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু যে উপায়ে শতসহস্র তরুণ-তরুণীর মন ফিরিয়া যায়; দেশের দূষিত হাওয়া পরিশুদ্ধ হইয়া নির্ম্মল হয়; ধর্ম্মভাব পুষ্ট হইয়া লোক নীতিমান হয়, ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রেরণা পাইয়া জাতির মেরুদণ্ড নৈতিক বলে বলীয়ান হয়, সেইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান সমাজে যে পরিবর্তন আনিতে পারে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া অন্যবিধ উপায়ে জাতি সেইরূপ সফলতার প্রত্যাশা করিতে পারে না। মুসলমানগণও তাহাদের নানা প্রাচীন উপাখ্যান লইয়া এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। তাঁহাদের কারবালা, সখিনা কাসেম এবং এজিদের কথা কথকতার বিষয় হইতে পারে।

এখন বিলাতী আমোদে প্রমোদে দেশ ছাইয়া গিয়াছে; সেই সকল আমোদ প্রায়ই ঠুনকো। তাহাতে সমাজের অকল্যাণ হইতেছে। এই সময়ে যদি আমরা প্রাচীন রাস্তাগুলি পরিষ্কার করি এবং জাতীয়তার ভাব লইয়া মহাজনগণের পদচারণপুণ্য সেই পন্থাগুলি সংস্কারপূর্ব্বক পুনরায় অবলম্বন করি, তাহা হইলে যোগ্য ও নিরন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের; তথা দেশীয় অন্যান্য সমাজের গুণী ব্যক্তিদের অন্ন-সমস্যার কতক পরিমাণে সমাধান হইতে পারে। শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি কথকতার উৎসাহ দেন; বিশ্ববিদ্যালয় যদি পুষ্টপোষকতা করেন এবং কথকদের গুণপনা যদি উপাধিবিতরণ দ্বারা নিজশক্তি কর্তৃক স্বীকৃত হয়, তবে এই অসার সিনেমা ও গ্রামোফোনের উৎপাত কতকটা কমিবে এবং পল্লীতে পল্লীতে গুণী ব্যক্তিদের জীবিকা-সংস্থানের কতকটা উপায় হইবে। আজকাল এদেশে মন্দিরে ঘণ্টা বাজাইয়া ও শিষ্যের কাণে ফুঁ দিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কিছুতেই জীবনধারণের উপায় করিতে পারিতেছেন না। কথকতায়দেশের নৈতিক ও ধর্ম্মজীবনের স্বাস্থ্য পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে। সুখের বিষয় বঙ্গের বিদুষী কন্যা শ্রীমতি অপর্ণাদেবী ও তাঁহার উদ্যমশীল স্বামী শ্রীযুক্ত সুধীর রায়; কীর্তনের প্রতি লোকের রুচি ফিরাইয়া আনিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। যেখানে অপর্ণা গান করেন, নাটোরের মহারাজা খোল বাজান, খগেন্দ্র মিত্র মন্দিরার মিষ্ট বোল দ্বারা সহযোগিতা

করেন এবং বঙ্গের একাধিক মহারাণী আসর উজ্জ্বল করিয়া কীর্ত্তনে উৎসাহ দেন, সে আসর ইহার মধ্যেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে।

আমরা সিনেমা ও গ্রামোফোনের সম্বন্ধে যাহা বলিলাম; পাঠকগণ তাহার ভুল অর্থ করিবেন না। সিনেমা ও গ্রামোফোন যন্ত্রজ ব্যাপার, ইহার সঙ্গীতের এবং দৃশ্যপটের রাজ্যে উপায় মাত্র। এই বৈজ্ঞানিক উপায় জগজ্জয়ী হইয়াছে, সুতরাং ইহারা অবহেলার পাত্র নহে। আমার মন্তব্য যাঁহারা যন্ত্র চালান, শুধু তাঁহাদের প্রতি। ইউরোপে তদ্দেশের সুখ, দুঃখ, সমাজ, আদর্শ ও সাময়িক উত্তেজনামূলক বিষয় এই সকল যন্ত্র-সাহায্যে সাধারণের গোচরীভূত হয়। তাহারা যে আমোদ চায়, তাহা প্রচুর পরিমাণে এই সকল যান্ত্রিক উপায় যোগদান দেয়। কিন্তু আমরা শুধু অনুকরণ করিতে ব্যস্ত। যে সকল বিষয়ে শুধু মুহূর্তের উত্তেজনা হয় এবং আদর্শ ও সমাজ সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন হওয়ার দরুণ আমাদের জন-সাধারণের প্রাণের সাড়া পাওয়ার দাবী করিতে পারে না, অথচ দুর্নীতির পথে পরিচালিত করে, আমরা শুধু সেই সকল বিষয়ের কথাই বলিয়াছি। □

১. "The Indian painters, though illiterate in the western sense, are the most cultured of their class." —(Introduction, XIX, *Ideals of the Indian Art*,—H. B. Havel)

২. "A very competent and independent witness Dr. Lefroy has testified from his long personal experience to the extraordinary aptitude with which the poorest and the most illiterate Hindu peasant will engage in discussion in the deepest philosophical and ethical questions."